উইলের খেয়াল

(গল্পগ্রন্থ - যাত্রাবদল)

দেশ থেকে রবিবারে ফিরছিলাম কল্‌কাতায়। সন্ধ্যার আর বেশি দেরি নেই, একটু আগে থেকেই প্লাটফর্মে আলো জ্বেলেচে, শীতও খুব বেশি। এদিকে এমন একটা কাম্‌রায়উঠে বসেচি, যেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই যার সঙ্গে একটু গল্পগুজব করি। আবার যার তার সঙ্গে গল্প করেও আনন্দ হয় না। আমার দরের কোনো লোকের সঙ্গে গল্প করে কোনো সুখ পাই নে, কারণ তারা যে কথা বলবে সেআমার জানা। তারা আমারই জগতের লোক, আমারমতোই লেখাপড়া তাদেরও, আমারই মতো কেরানীগিরি কিইস্কুল-মাস্টারি করে, আমারই মতো শনিবারে বাড়ি এসেআবার রবিবারে কলকাতায় ফেরে। তারা নতুন খবর আমায়কিছুই দিতে পারবে না, সেই একঘেয়ে কল্‌কাতার মাছেরদর, এম.সি.সি.'র খেলা, ইস্টবেঙ্গল সোসাইটির দোকানেশীতবস্ত্রের দাম, চণ্ডীদাস কি সাবিত্রী ফিলমের সমালোচনা—এসব শুনলে গা বমি-বমি করে। বরং বেগুনের ব্যাপারি, কিকন্যাদায়গ্রস্ত পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোক, কি দোকানদার—এদেরঠিকমতো বেছে নিতে পারলে, কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু বেছে নেওয়া বড় কঠিন-কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক ভেবে যাঁর কাছে গিয়েচি, অনেক সময় দেখেচি তিনি ইন্‌সিওরেন্সের দালাল।

একা বসে বিড়ি খেতেখেতে প্লাটফর্মের দিকে চেয়েআছি, এমন সময় দেখি আমার বাল্যবন্ধু শান্তিরাম হাতেএকটা ভারী বোঁচকা ঝুলিয়ে কোন্‌গাড়িতে উঠবে ব্যস্তভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি ডাকতেই 'এই যে !'বলে একগালহেসে আমার কামরার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌ে—বোঁচকাটা একটুখানি ধরো না ভাই কাইন্ডলি—

আমি তার বোঁচকাটা হাত বাড়িয়ে গাড়িতে তুলেনিলাম—পেছনে পেছনে শান্তিরামও হাঁপাতে হাঁপাতে উঠেআমার সামনের বেঞ্চিতে মুখোমুখি হয়ে বস্‌লো। খানিকটাঠান্ডা হয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বল্‌ে—বিড়ি আছে ?কিন্‌তে ভুলে গেলাম তাড়াতাড়িতে। আর ক'মিনিট আছে ?পৌনে ছ'টা না রেলওয়ের ?আমি ছুটচি সেই বাজারথেকে—আর ওই ভারী বোঁচকা ! প্রাণ একেবারে বেরিয়ে গিয়েচে। কল্‌কাতায় বাসা করা গিয়েচে ভাই, শনিবারেবাড়ি আসি। বাগানের কলাটা, মুলোটা যা পাই নিয়ে যাই এসে—সেখানে তো সবই—হুঁ হুঁ—বুঝলে না ?দাঁতন-কাঠিটাএস্তেক তাও নগদ পয়সা। প্রায় তিন-চার দিনের বাজারখরচ বেঁচে যায়। এই দ্যাখো ওল, পুঁইশাক, কাঁচা লঙ্কা, পাটালি...দেখি দেশলাইটা—

শান্তিরামকে পেয়ে খুশি হলাম। শান্তিরামের স্বভাবই হচ্চে একটু বেশি বকা। কিন্তু তার বকুনি আমার শুনতেভালো লাগে। সে বকুনির ফাঁকে ফাঁকে এমন সবপাড়াগাঁয়ের ঘটনার টুকরো ঢুকিয়ে দেয়, যা গল্প লেখারচমৎকার—অতি চমৎকার উপাদান। ওর কাছে শোনা ঘটনা নিয়ে দু-একটা গল্প লিখেচিও এর আগে। মনে ভাবলামশান্তিরাম এসেছে, ভালোই হয়েচে। একা চার ঘণ্টার রাস্তাযাব, তাতে এই শীত। তা ছাড়া এই শীতে ওর মুখের গল্পজমবেও ভালো।

হঠাৎ শান্তিরাম প্ল্যাটফর্মের দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকতে লাগল—অবনী ও অবনী, এই যে, এই গাড়িতে এসো, কোথায় যাবে ?

গুটি তিন-চার ছেলেমেয়ে, এক পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরেরস্বাস্থ্যবতী ও সুশ্রী একটি পাড়াগাঁয়ের বউ আগে আগে, পিছনে একটি ফর্সা একহারা চেহারার লোক, সবার পিছনেবাক্স পেটরা মাথায় জন দুই কুলি। লোকটি আমাদের কামরার কাছে এসে দাঁড়িয়ে হেসে বল্‌লে—এই যে দাদা, কল্‌কাতাফিরচেন আজই ! আমি ?আমি একবার এদের নিয়ে যাচ্চিপাঁচঘরার ঠাকুরের থানে। মসলন্দপুর স্টেশনে নেমে যেতেহবে; বাস পাওয়া যায়।

দলটি আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে খালি একটাইন্টার ক্লাস কামরায় উঠল।

শান্তিরাম চেয়ে চেয়ে দেখে বল্‌ে—তাই অবনী এখানেএল না, ইন্টার ক্লাসের টিকিট কিনা ?আঙুল ফুলে কলাগাছ একেই বলে ! ওই অবনীদের খাওয়া জুটত না, আজ দল বেঁধে ইন্টার ক্লাসে চেপে বেড়াতে যাচ্চে...ভগবান যখন যাকে দ্যান্‌—আমাদের বোঁচকা বওয়াই সার।

গাড়ি ছাড়লো। সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারে পাম্পিং এঞ্জিনের শেড, কেবিনঘর, ধূমাকীর্ণ কুলিলাইন সট সট করে দু-পাশ কেটে বেরিয়ে চলেছে, সামনে সিগন্যালের সবুজ বাতি, তারপর দু-পাশে আখের ক্ষেত, মাঠ,

বাবলা বন।শান্তিরামের গলার সুর শুনে বুঝলাম, সে গল্প বলারমেজাজে আছে, ভালো করে আলোয়ান গায়ে দিয়েবসলাম, উৎসুক মুখে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

শান্তিরাম বল্‌লে—অবনীকে এর আগে কখনোদেখোনি ?নিশ্চয় দেখেছ ছেলেবেলায়, ও আমাদের নীচের ক্লাসে পড়ত আর বেশ ভালো ফুটবল খেলতো—মনে নেই ?ওর বাবা কোর্টে নকলনবিশি করতেন, সংসারেরঅভাব-অনটন টানাটানি বেড়েই চলেছিল। সেই অবস্থায়অবনীর বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে আনলেন। বল্‌লেন—কবে মরেযাব, ছেলের বউয়ের মুখ দেখে যাই। বাঁচলেনও নাবেশিদিন, একপাল পুষ্যি আর একরাশ দেনা ছেলের ঘাড়েচাপিয়ে দিয়ে সংসার থেকে বিদায় নিলেন।

তারপর কি কষ্টটাই গিয়েচে ওদের। অবনী পাস করতে পারলে না, চাকরিও কিছু জুটলো না, হরিণখালির বিলেরএক অংশ ওদের ছিল অনেক কাল আগে থেকে—শোলাহত সেখানে, সেই বিলের শোলা ইজারা দিয়ে যে কটাটাকা পেত, তাই ছিল ভরসা।

ওদের গাঁয়ে চৌধুরীপাড়ায় নিধিরাম চৌধুরী বলে একজন লোক ছিল। গাঁয়ে তাকে সবাই ডাকত নিসু চৌধুরী। নিসু চৌধুরীর কোনো কুলে কেউ ছিল না, বিয়ে করেছিল, দু-দুবার, ছেলেপুলেও হয়েছিল কিন্তু টেকেনি। ওর বাবাসেকালে নিম্‌কির দারোগা ছিল, বেশ দু-পয়সা কামিয়েবিষয়-সম্পত্তি করে গিয়েছিল। তা শালিয়ানা প্রায় হাজারবারো'শ টাকা আয়ের জমা, আম-কাঁটালের বাগান, বাড়িতেতিনটে গোলা, এক-একটা গোলায় দেড়পাট দু-পাট করেধান ধরে, দুটো পুকুর, তেজারতি কারবার। নিসু চৌধুরীইদানীং তেজারতি কারবার গুটিয়ে ফেলে জেলার লোনঅফিসে নগদ টাকাটা রেখে দিত। সেই নিসু চৌধুরীর বয়স হল, ক্রমে শরীর অপটু হয়ে পড়তে লাগল, সংসারে মুখেজলটি দেবার একজন লোক নেই। আবার পাড়াগাঁয়েরব্যাপার জানো তো ?পয়সা নিয়ে বাড়িতে কাউকে খেতেদেওয়া—এ রেওয়াজ নেই। তাতে সমাজে নিন্দে হয়, সেকেউ করবে না। নিসু চৌধুরী এমন একবার অসুখে পড়েদিনকতক বড় কষ্ট পেলে—এসব দিকের পাড়াগাঁয়ের জানোতো ভায়া, না পাওয়া যায় রাঁধুনী বামুন, না পাওয়া যায়চাকর, পয়সা দিলেও মেলানো যায় না। দিন দশ-বারোভুগবার পর উঠে একটু সুস্থ হয়ে একদিন নিসু চৌধুরীঅবনীকে বাড়িতে ডাকালে। বললে—বাবা অবনী, আমার কেউ নেই, এখন তোমরা পাঁচজন ভরসা। তা তোমার বাবা আমায় ছোট ভাইয়ের মতো দেখতেন, তোমাদের পাড়ায়তখন যাতায়াতও ছিল খুব। তারপর এখন শরীরও হয়েপড়েচে অপটু, তোমাদের যে গিয়ে খোঁজখবর করব, তাওআর পারি নে। তা আমি বলচি কি, আমার যা আছে সবলেখাপড়া করে দিচ্চি তোমাদের, নাও—নিয়ে আমাকে তোমাদের সংসারে জায়গা দেও। তুমি আমার দীনু-দারছেলে, আমার নিজের ছেলেরই মতো। তোমাকে আর বেশিকি বলব বাবা ?

অবনী আশ্চর্য হয়ে গেল। নিসু চৌধুরীর নগদ টাকা কত আছে কেউ অবিশ্যি জানে না, কিন্তু বিষয়-সম্পত্তির আয়, ধান—এ-সব যা আছে, এ গাঁয়ে এক রায়েদের ছাড়া আরকারু নেই। সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিতে চায় নিসু চৌধুরীতার নামে !অবনীর মুখ দিয়ে তো কথা বেরুলো নাখানিকক্ষণ। তারপর বললে—আচ্ছা কাকা, বাড়িতে একবারপরামর্শ করে এসে কাল বলব।

নিসু চৌধুরী বললে—বেশ বাবা, কিন্তু এ-সব কথা এখনযেন গোপন থাকে।

পরদিন গিয়ে অবনী জানালে এ প্রস্তাবে তাদের কোনোআপত্তি নেই। নিসু চৌধুরী বললে—বউমা তাহলে রাজীহয়েছেন ?দ্যাখো, তা হলে আমার একটা সাধ আছে, সেটাবলি। আমার এত বড় বাড়িখানা পড়ে আছে, অনেক দিনএতে মা-লক্ষ্মীদের চরণ পড়েনি, ঠিকমতো সন্ধ্যে পড়ে না।তোমাদের ও-বাড়িটাও তো ছোট, ঘর-দোরে কুলোয় না, তা ছাড়া পুরোনোও বটে। তোমরা আমার এখানে কেন এসো না সবসুদ্ধ ?তোমারই তো বাড়িঘর হবে, তোমাকেইসব দিয়ে যখন যাব, তখন এখন থেকে তোমার নিজেরবাড়ি তোমরা না দেখলে নষ্ট হয়ে যাবে যে !

এ প্রস্তাবেও অবনী রাজি হল, একটা ভালো দিন দেখে সবাই এ বাড়িতে চলে এল। অবনীর বউ নিসু চৌধুরীর বাড়ি কখনো দেখেনি, কারণ সে ও-পাড়ার বউ, এ-পাড়ায় আসবার দরকার তেমন হয়নি কখনো। ঘর-বাড়ি দেখে বউ যেমন অবাক্ হয়ে গেল, তেমনি খুশি হল। নিসু চৌধুরীর বাবা রোজগারের প্রথম অবস্থায় শখ করে বাড়ি উঠিয়েছিলেন—তখনকার দিনে সস্তাগণ্ডার বাজার ছিল, দেখে অবাক হবার মতো বাড়িই করেছিলেন বটে, পাড়াগাঁয়ের পক্ষে অবিশ্যি। কল্‌কাতার কথা ছেড়ে দেও। মস্ত দোতলা বাড়ি ওদের, নীচে বড় বড় সাত-আটখানা ঘর, বারান্দা, প্রকাণ্ড ছাদ, সানবাঁধানো উঠোন, ভেতর বাড়িতে পাকা রান্নাঘর, ইঁদারা, বাইরে প্রকাণ্ড বৈঠকখানা। বাড়ির পেছনে ফলের বাগান, ছোট একটা পুকুর, বাঁধানো ঘাট—পাড়াগাঁয়ে সম্পন্ন গেরস্তবাড়ি যেমন হয়ে থাকে।

ওরা বাড়িতে উঠে এসে জাঁকিয়ে সত্যনারায়ণের পুজোদিলে, লোকজন খাওয়ালে, লক্ষ্মীপুজো করলে। সবাইবল্‌লে অবনীর বউয়ের পয় আছে, নইলে অমনবিষয়-সম্পত্তি পাওয়া কি সোজা কথা আজকালকারবাজারে। আবার অনেকেরই চোখ টাটালো।

এ-সব হল গিয়ে ও-বছর ফাল্গুন মাসের কথা। গত বছরবোশেখ মাসে নিসু চৌধুরী মারা গেল। জ্বর হয়েছিল, অবনী ভালো ভালো ডাক্তার দেখালে, খুলনা থেকে নৃপেনডাক্তারকে নিয়ে এল—বিস্তর পয়সা খরচ করলে, অবনীরবউ মেয়ের মতো সেবা করলে—কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা।অবনী বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করলে খুব ঘটা করে, সমাজখাওয়ালে—তা সবাই বল্‌লে দেখেশুনে যে নিজের ছেলে থাকলে নিসু চৌধুরীর—সে-ও এর বেশি আর কিছু করতেপারত না। তারপর এখন ওরাই সম্পত্তির মালিক, অবনী নিজেই খাটিয়ে ছেলে, কোনো নেশা-ভাঙ্ করে না, অতিসৎ। কাজেই বিষয় উড়িয়ে দেবে সে ভয় নেই, দেখেশুনেখাবার ক্ষমতা আছে।

তাই বলছিলাম, ভগবান যাকে দেন, তাকে এমনি করেইদেন। ওই অবনীর বউ আঁচল পেতে চাল ধার করে নিয়েগিয়েচে আমার মাসিমাদের বাড়ি থেকে, তবে হাঁড়ি চড়েচে—এমন দিনও গিয়েচে ওদের। আমার মাসিমার বাড়িওদের একই পাড়ায় কিনা ?তারই মুখে সব শুনতে পাই।আর তারাই এখন দেখো ইন্টার ক্লাসে—ভগবান যখনযাকে—

অবনীর বউটি খুব ভালো, অত্যন্ত গরিব ঘরের মেয়ে ছিল, পড়েছিলও তেমনি গরিবের ঘরে। সে নাকি মাসিমার কাছে বলেচে, যা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি দিদি তাই যখন হল, এখন ভাবি, ভগবান সব বাঁচিয়ে বর্তে রাখলে হয়। গরিব লোকের কপাল, ভরসা করতে ভয় পাই দিদি। প্রথম যেদিন বাড়িতে ঢুকলাম, দেখি এ যেন রাজবাড়ি, অত ঘরদোর, অত বড় জানলা দরজা, এতে আমার ছেলে-মেয়েরা বাস কত্তে পারবে, জানো তো কি অবস্থায় ছিলাম—তোমার কাছে আর কি লুকব ?এ যেন সবই স্বপ্ন বলে মনে হয়েছিল। এখন ব্রতটা নেম্‌টা করে, দু-দশ জন ব্রাহ্মণের পাতে দু-মুঠো ভাত দিয়ে যদি ভালোয় ভালোয় দিনগুলো কাটাতে পারি, তবে তো মুখ থাকে লোকের কাছে। সেই আশীর্বাদ করো তোমরা সকলে।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিধারে খুব গাঢ় হয়েচে। ট্রেন হু-হুকরে অন্ধকার মাঠ, বাঁশবন, বিল, জলা, আখের ক্ষেত, মাঝে মাঝে ঘন অন্ধকারের মধ্যে জোনাকি-জ্বলা ঝোপ পারহয়ে উড়ে চলেচে, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, খড়ে-ছাওয়া বিশ-ত্রিশটা চালাঘর এক জায়গায় জড়াজড়ি করে আছে, দু-চার-দশটা মিট্‌মিটে আলো জ্বলে অন্ধকারে ঢাকা গাছপালায় ঢাকা গ্রামগুলোকে কেমন একটা রহস্যময় রূপদিয়েচে।

একটা বড় গ্রামের স্টেশনে অবনী তার বউ ওছেলেমেয়েকে নিয়ে নেমে গেল। স্টেশনের বাইরে একখানাছইওয়ালা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, বোধ হয় ওদেরইজন্যে। অবনীর বউকে এবার প্লাটফর্মের তেলের লণ্ঠনেরঅস্পষ্ট আলোয় দেখে আরো বেশি করে মনে হল যেমেয়েটি সত্যিই সুশ্রী। বেশ ফর্সা রং, সুঠাম বাহু দুটির গড়ন, চলনভঙ্গি ও গলার সুরের সবটাই মেয়েলি। এমন নিখুঁতমেয়েলি ধরনের মেয়ে দেখবার একটা আনন্দ আছে, কারণসেটা দুষ্প্রাপ্য। ট্রেনখানা প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল; একজন লোক হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে ওদের এগিয়ে নিতেএসেছিল, ওরা তার সঙ্গে স্টেশনের বাইরে যেতে গিয়েফটক খোলা না পেয়ে

দাঁড়িয়ে রইল, কারণ যিনিস্টেশন-মাস্টার তিনিই বোধ হয় টিকিট নেবেন যাত্রীদেরকাছ থেকে—ফটকে চাবি দিয়ে তিনি গার্ডকে দিয়ে প্লাটফর্মের মধ্যে আঁধারে লণ্ঠনের আলোয় কি কাগজপত্রসই করাচ্ছিলেন।

তারপর ট্রেন আবার চলতে লাগল—আবার সেই রকম ঝোপ-ঝাপ, অন্ধকারে ঢাকা ছোটখাটো গ্রাম, বড় বড় বিল, বিলের ধারে বাগ্‌দিদের কুঁড়ে। আমার ভারি ভালো লাগছিল—এইসব অজানা ক্ষুদ্র গ্রামে ঘরে ঘরে অবনীর বউয়ের মতো কত গৃহস্থবন্ধু ভারবাহী পশুর মতো উদয়াস্ত খাট্‌চে হয়তো পেট পুরে দু-বেলা খেতেও পায় না, ফর্সা কাপড় বছরে পরে হয়তো দু দিন কি তিন দিন, হয়তো সেই পুজোর সময় একবার, কোনো সাধ-আহ্লাদ পুরে না মনের, কিছু দেখে না, জানে না, বোঝে না, মনে বড় কিছু আশা করতে শেখেনি, বাইরের দুনিয়ার কিছু খবর রাখে না—পাড়াগাঁয়ের ডোবার ধারের বাঁশবাগানের ছায়ায় জীবন তাদের আরম্ভ, তাদের সকল সুখ-দুঃখ, আনন্দ, আশা-নিরাশার পরিসমাপ্তিও ওইখানে।

অবনীর বউ গৃহস্থ বধূদেরই একজন। অন্তত ওদেরএকজনও তার সাধের স্বর্গকে হাতে পেয়েচে। অন্ধকারের মধ্যে আমি বসে বসে এই কথাই ভাবছিলাম। আমি কল্পনাকরবার চেষ্টা করলাম অবনীর বউকে, যখন সে প্রথমনিসুচৌধুরীর বাড়িতে এল—কি ভাবলে অত বড় বাড়িটা দেখে, ...অত ঘরদোর !...যখন প্রথম জানলে যে সংসারের দুঃখদূর হয়েচে, প্রথম যখন সে তার ছেলেমেয়েদের ফর্সা কাপড়পরতে দিতে পারলে, আমি কল্পনা করলাম দশঘরার হাটথেকে অবনী বড় মাছ, সন্দেশ, ছানা কিনে বাড়িতেএসেচে... অবনীর বউ এই প্রথম সচ্ছলতার মুখ দেখলে।তার সে খুশি-ভরা চোখমুখ অন্ধকারের মধ্যে দেখতেপাচ্ছি ।...

ট্রেন আর একটা স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েচে। শান্তিরাম আলোয়ান মুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে, মাঝে মাঝে ঢুলচে। স্টেশনে পানের বোঝা উঠচে। শান্তিরামকেবললাম—শান্তিরাম, ঘুমুচ্চ নাকি ?আমি একটা গল্প জানি এই রকমই, তোমার গল্পটা শুনে আমার মনে পড়েচে সেটা, শুনবে ?...

কিন্তু শান্তিরাম এখন গল্প শুনবার মেজাজে নেই। সেআরামে ঠেস দিয়ে আরো ভালো করে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসলো। সে একটু ঘুমোবে।

পূর্ণবাবুর কথা আমার মনে পড়েচে, শান্তিরামের গল্পটা শুন্‌বার পরে এখন। পূর্ণবাবু আমিন ছিল, পাটনায় আমরা একসঙ্গে কাজ করেচি। পূর্ণবাবুর বয়স তখন ছিল পঞ্চাশ কি বাহান্ন বছর। লম্বা রোগা চেহারা, বেজায় আফিম খেতো—দাঁত প্রায় সব পড়ে গিয়েছিল, মাথার চুল সাদা, —নাক বেশ টিকলো, অমন সুন্দর নাক কিন্তু আমি কম দেখেছি, রং না-ফর্সা না-কালো। পূর্ণবাবু কম মাইনে পেত, এখানে কোনো রকমে চালিয়ে বাড়িতে তার কিছু টাকা না পাঠালেই চলবে না—কাজেই তার পরনে ভালো জামা-কাপড় একদিনও দেখিনি। পূর্ণবাবু নিজে রেঁধে খেত। একদিন তার খাবার সময় হঠাৎ গিয়ে পড়েচি—দেখি পূর্ণবাবু খাচ্চে শুধু ভাত—কোনো তরকারি, কি শাক, কি আলুভাতে—কিছু না, কেবল একতাল সবুজ পাতালতা-বাটা ওষুধের মতো দেখতে—কি একটা দ্রব্য ভাতের সঙ্গে মেখে মেখে খাচ্চে। জিজ্ঞাসা করে জান্‌লাম, সবুজ রঙের দ্রব্যটা কাঁচা নিমপাতা-বাটা। পূর্ণবাবু একটু অপ্রতিভের সুরে বললেন, নিমপাতা-বাটা এত উপকারী, বিশেষ করে লিভারের পক্ষে। ভাত দিয়ে মেখে যদি খাওয়া যায়—আমি আজ দু'বছর ধ'রে—আজ্ঞে দেখবেন খেয়ে, শরীর বড় ঠান্ডা—তা ছাড়া কি জানেন, লোভ যত বাড়াবেন ততই বাড়বে—

উপকারী দ্রব্য তো অনেকই আছে, ডাল ঝোলের বদলেকুইনাইন মিকশ্চার ভাতের সঙ্গে মেখে দু-বেলা খাওয়ারঅভ্যেস করতে পারলে দেশের ম্যালেরিয়া সমস্যার একটাসুসমাধান হয়, তাও স্বীকার করি। কিন্তু জীবনে বড় বড়উপদেশগুলো চিরকাল লঙ্ঘন করে চলে এসে এসে আজ নীতি ও স্বাস্থ্য পালন সম্বন্ধে এত বড় একটা সজীব আদর্শচোখের সামনে পেয়ে খানিকক্ষণের জন্যে নির্বাক হয়ে গেলাম। আর একদিন দু-দিন নয়, দু-বছর ধরে চলচে এব্যাপার !

একদিন পূর্ণবাবু নিজের জীবনের অনেক কথা বললেন।কল্‌কাতায় তাঁদের বাড়ি, ভবানীপুরে। তাঁর একজন পিসিমাআছেন, একটু দূর সম্পর্কের। সেই পিসিমার মৃত্যুর পরেতাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন পূর্ণবাবু। কিন্তু পিসিমা মরি-মরি করচেন আজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর।

পূর্ণবাবুর বিবাহ হয় বাগবাজারের সম্ভ্রান্ত বংশেরমেয়ের সঙ্গে—তবে তখন তাদের অবস্থা খুব ভালো ছিলনা।পূর্ণবাবুদের পৈতৃক বাড়িও নেই কল্‌কাতায়, ভবানীপুরেখুব আগে নাকি প্রকাণ্ড বাড়ি পুকুর ছিল, এখন তাঁদেরদু-পুরুষ ভাড়াটে বাড়িতে থাকে। পূর্ণবাবুর আঠার-উনিশবছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়, তিনি ছেলের জন্য শুধু যেকিছু রেখে যাননি তা নয়, ছেলেটিকে লেখাপড়াওশেখাননি। কারণ তিনিও জানতেন এবং সবাই জানত যেতার দরকার নেই, অতবড় সম্পত্তির যে মালিক হবে দু-দিনপরে—তার কি হবে লেখাপড়ায় ?

ছেলেটিও জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত তাই জান্‌ত বলে লেখাপড়াশেখবার কোনো চেষ্টাও ছিল না। পূর্ণবাবুর শ্বশুরও তাই ভেবে মেয়েকে ওই গরিব ঘরে দিয়েছিলেন।

পূর্ণবাবুর বাবা তো মারা গেলেন, পূর্ণবাবুর ঘাড়ে রেখে গেলেন সংসার, নব-বিবাহিতা পুত্রবধূ, অল্প কিছু দেনা। কিন্তু পূর্ণবাবুর ক্রেডিট তখন পুরোমাত্রায়—কি বাজারে কিবন্ধুবান্ধব মহলে। টাকা হাত পাত্‌লেই পাওয়া যায়—ধারেদোকানে জিনিস পাওয়া যায়, নিত্য নূতন বন্ধু জোটে।পূর্ণবাবু খুশি, পূর্ণবাবুর তরুণী বউ খুশি, আত্মীয়-স্বজন খুশি, বন্ধুবান্ধব খুশি। কারণ সবাই জানে, বুড়ি আর কদিন ?না হয় মেরে কেটে আর পাঁচটা বছর !

অবিশ্যি পূর্ণবাবুর তখন বয়স অনেক কম, সংসারেরকিছুই বোঝেন না, জানেন না—মনে উৎসাহ, আশা অদম্য, আনন্দের উৎস—চোখের সামনে দীপ্ত রঙিন ভবিষ্যৎ—যেভবিষ্যতের সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, আশঙ্কানেই, যা একদিন হাতের মুঠোয় ধরা দেবেই—এ অবস্থায়যে যা বুঝিয়েচে পূর্ণবাবু তাই-ই বুঝেচেন, টাকাকড়ি ধারকরে দু'হাতে উড়িয়েচেন, বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যও করেচেন, ধারে যতদিন এবং যতটা নবাবি করা চলে, বাকি রাখেননি।

কিন্তু ক্রমে বছর যেতে লাগল, দু-তিন বছর পরে আরধার মেলে না—সকলেই হাত গুটিয়ে ফেললে।পাওনাদারের যাতায়াত শুরু হল এইজন্যে—আরো বিশেষকরে পূর্ণবাবু বাজারে ক্রেডিট হারিয়ে ফেললেন যে, সবাইদেখলে পূর্ণবাবুর পিসিমা ওঁদের আদৌ বাড়িতে ডাকেন না, পূর্ণর্বাবুকেও না, পূর্ণবাবুর বউ ছেলেমেয়ে কাউকে না।

পিসিমার কাছে খাতির পেলে বাজারেও পূর্ণবাবুরখাতির থাক্‌তো—অনেকে বল্‌তে লাগলো পূর্ণবাবুর পিসিমাওদের দেখতে পারে না, সমস্ত সম্পত্তি হয়তো দেবোত্তরকরে দিয়ে যাবে—একটি পয়সাও দেবে না ওদের।

পূর্ণবাবুর পিসিমার বিশ্বাস যে এরা তাঁকে বিষ খাইয়েমারবে—যত বয়স হচ্ছে এ বিশ্বাস আরো দিন দিনবাড়চে—এতে করে হয়েচে এই যে পূর্ণবাবুর, কি পূর্ণবাবুরস্ত্রীর, কি পূর্ণবাবুর ছেলেমেয়ের পিসিমার বাড়িরত্রি-সীমানায় ঘেঁষবার যো নেই। কাজেই অতবড় সম্পত্তিরউত্তরাধিকারী হয়েও পূর্ণবাবু আজ ত্রিশ টাকা মাইনেরআমিনগিরি করচেন।

আমি পূর্ণবাবুর এ গল্প বিশ্বাস করিনি। কিন্তু সেটেলমেন্টক্যাম্পে আমরা একসঙ্গে দেড় বছরের উপর ছিলাম—এই দেড় বছরের প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় কি রাত্রে একসঙ্গেবস্‌বার সুযোগ হলেই পূর্ণবাবু আমায় তাঁর পিসিমারসম্পত্তির গল্প করতেন। কখন কোন্‌টা হয়তো বলেফেলেচেন ছ-মাস আগে তাঁর মনে থাকবার কথা নয়, আবার আজ যখন নতুন কথা বল্‌চেন ভেবে বল্‌লেন। তখনখুঁটিনাটি ঘটনাগুলোও ছ-মাস আগের কাহিনীর সঙ্গে মিলেযেত—নানা টুকরো কথার জোড়াতালি মিলিয়ে এই দেড়বছরে পূর্ণবাবুর সমস্ত গল্পটা আমি জেনেছিলুম—একদিনতিনি বসে আগাগোড়া গল্প আমায় করেননি, সে ধরনেরগল্প করার ক্ষমতাও ছিল না পূর্ণবাবুর।

সেই থেকে পূর্ণবাবুর দুর্দশার সূত্রপাত হল। বন্ধুবান্ধবছেড়ে গেল, শ্বশুরবাড়িতে খাতির কমে গেল, সংসারেদারিদ্রের ছায়া পড়ল। দু-এক জন হিতৈষী বন্ধুর পরামর্শে পূর্ণবাবু আমিনের কাজ শিখতে গেলেন—বউ-ছেলেকেবাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

এ সব আজ ত্রিশ বছর আগেকার কথা।

এই ত্রিশ বছরে পূর্ণবাবু আমোদপ্রিয়, শৌখিনচিত্ত, অপরিণামদর্শী যুবক থেকে কন্যাদায়গ্রস্ত, রোগ-জীর্ণ, অকাল-বৃদ্ধ, দারিদ্রভারে কুব্জদেহ ত্রিশটাকা মাইনের আমিনে পরিণত হয়েচেন—এখন আর মনে তেজ নেই, শরীরে বল নেই, খেলে হজম করতে পারেন না, চুল অধিকাংশই পেকে গিয়েচে, কষের অনেকগুলো দাঁত পড়ে গেলেও পয়সার অভাবে বাঁধাতে পারেন না বলে গালে টোল খেয়ে যাওয়ায় বয়সের চেয়েও বুড়ো দেখায়।

বাড়ির অবস্থাও ততোধিক খারাপ। পনেরো টাকা ভাড়ারএঁদো ঘরে বাস করার দরুন স্ত্রী ছেলেমেয়ে সকলেই নানারকম অসুখে ভোগে—অথচ উপযুক্ত চিকিৎসা হয় না। তিনটি মেয়ের বিয়েতে পূর্ণবাবু একেবারে সর্বস্বান্ত হয়েগিয়েচেন, অথচ মেয়ে তিনটির প্রথম দুটি ঘোর অপাত্রেপড়েছে। বড় জামাই বউবাজারে দরজির দোকান করে, ঘোরমাতাল, কুচরিত্র—বাড়িতে স্ত্রীকে মারপিট করে প্রায়ই, তবুও সেখানে মেয়েকে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে হয়—বাপের বাড়ি এলে শোবার জায়গাই দেওয়া যায় না। মেজ জামাই মাতাল নয় বটে, কিন্তু তার এক পয়সা রোজগারের ক্ষমতানেই—রেলে সামান্য কি চাকুরি করে, সে-সংসারে সবাই একবেলা খেয়ে থাকে, তাই নাকি অনেক দিন থেকে নিয়ম।আর একবেলা সকলে মুড়ি খায়। মেজ মেয়ের দুঃখ পূর্ণবাবুদেখতে পারেন না বলে মাঝে মাঝে তাকে বাড়িতে আনিয়েরাখেন; সেখানে এলে তবু মেয়েটা খেতে পায় পেট পুরেদু-বেলা। আজকাল প্রায়ই জ্বরে ভোগে, শরীরও খারাপ হয়ে গিয়েচে, ডাক্তারে আশঙ্কা করচে থাইসিস। বুড়ি পিসিমা কিন্তু এখনো বেঁচে। এখনো বুড়ি গঙ্গাস্নানে যায়, নিজের হাতে রেঁধে খায়। বয়স নব্বই-এর কাছাকাছি, কিন্তু এখনো চোখের তেজ বেশ, দাঁত পড়েনি। বুড়ি একেবারে অশ্বত্থমার পরমায়ু নিয়ে জন্মেছে, এদিকে যারা তারমরণের পানে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, তাদের জীবনকাটিয়ে শেষ হতে চলল।

সেটেলমেন্টের কাজ ছেড়ে পাটনা থেকে চলে এলাম। পূর্ণবাবু তখনো সেখানে আমিন। বছর তিনেক পরে একদিনগয়া স্টেশনে পূর্ণবাবুর সঙ্গে দেখা। দুপুরের পর এক্সপ্রেসআসবার সময় স্টেশনের প্লাটফর্মে পায়চারি করচি, একটুপরেই ট্রেনটা এসে দাঁড়ালো। পূর্ণবাবু নামলেন একটাসেকেন্ড ক্লাস কামরা থেকে, অন্য কামরা থেকে দুজনদারোয়ান নেমে এসে জিনিসপত্রের তদারকে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। পূর্ণবাবুর পরনে দামী কাঁচি ধুতি, গায়ে সাদা সিল্কের পাঞ্জাবি, তার ওপরে জমকালো পাড় ও কল্কাদার শাল, পায়ে প্যারিস গার্টার আটা সিল্কের মোজা ও পাম্পশু, চোখে সোনার চশমা, হাতে সোনার ব্যান্ডওয়ালা হাতঘড়ি।

আমি গিয়ে আলাপ করলাম। পূর্ণবাবু আমায় চিনতেপেরে বললেন—এই যে রামরতনবাবু, ভালো আছেন ?তারপর, এখন কোথায় ?

আমি বললাম—আমি এখানে চেঞ্জে এসেছিমাস-তিনেক, আপনি এদিকে—ইয়ে—

তাঁর অদ্ভুত বেশভূষার দিকে চেয়ে আমি কেমন হয়েগিয়েছিলাম। পূর্ণবাবুকে এ বেশে দেখতে আমি অভ্যস্ত নই, আমার কাছে সুতির ময়লা-চিট সোয়েটার ও সবুজআলোয়ান গায়ে পূর্ণবাবু বেশি বাস্তব,—তাছাড়াচুয়ান্ন-পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধের এ কি বেশ !

কি ব্যাপারটা ঘটেচে তা অবশ্য পূর্ণবাবু বলবার আগেইআমি বুঝতে পেরেছিলাম।

জিনিসপত্র গুছিয়ে পূর্ণবাবু ওয়েটিং রুমে ঢুকলেন; তিনিসাউথ বিহার লাইনের গাড়িতে যাবেন। গাড়ির এখনো ঘণ্টা-দুই দেরি। একজন দারোয়ানকে ডেকেবললেন—ভূপাল সিং, এখানে ভালো সিগারেট পাওয়া যায়কিনা দেখে এসো—নইলে কাঁচি নিয়ে এসো এক বাক্স—

আমায় বললেন—ওঃ, অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গেদেখা। আর বলেন কেন, বিষয় থাকলেই হাঙ্গামা আছে।সামনে আস্‌চে জানুয়ারি কিস্তি—তহশীলদার বেটা এখনোএক পয়সা পাঠায়নি, লিখেচে এবার নাকি

কলাই ফসল সুবিধে হয়নি। তাই নিজে যাচ্ছিমহালে, মাসখানেক থা। গাড়িটা এখানে আসে কটায় ?ভালো কথা, এখানেটাইমটেবেল কিন্‌তে পাওয়া যাবে ?কিনতে ভুল হয়ে গেলহাওড়ায়—

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার পিসিমা ?

দারোয়ান সিগারেট নিয়ে এল। পূর্ণবাবু একটা সরু ওসুদীর্ঘ হোল্ডার বার করলেন, আমার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললেন, আসুন।

তারপর সিগারেট ধরিয়ে আরামে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—পিসিমা মারা গিয়েচেন আরবছর কার্তিক মাসে।তারপর থেকেই বিষয়-আশয়ের ঝঞ্ঝাটে পড়েচি—নিজে নাদেখলে কি জমিদারি টেকে ?আর এই বয়সে ছুটোছুটি করেপারি নে, একটা ভালো কাজ-জানা লোকের সন্ধান দিতেপারেন রামরতনবাবু ?টাকা-চল্লিশ মাইনে দেব, খাবেথাকবে—

ওয়েটিং রুমে বসে পূর্ণবাবু দু-বোতল লেমনেড খেলেন এই শীতকালে। একবার দারোয়ানকে দিয়ে গরম জিলিপিআনালেন দোকান থেকে, একবার নিম্‌কি বিস্কুট আনালেন।আর একবার নিজে স্টেশনের বাইরে দোকান থেকে একডজন কমলালেবু কিনে আনলেন। আমায় প্রতিবারেই খাওয়ানোর জন্য পীড়াপীড়ি করলেন, কিন্তু আমার শরীরখারাপ, খেতে একেবারেই পারি নে, সে কথা জানিয়ে ক্ষমাচাইলাম। একটু পরেই পূর্ণবাবুর ট্রেন এসে পড়ল।

দিন পনের কুড়ি পরে আবার বেড়াতে গিয়েচি স্টেশনে। সেদিন শীত খুব পড়েচে, বেশ জ্যোৎস্না, রাতআটটার কম নয়। স্টেশনের রাস্তা যেখানে ঠেকেছে সেখানেচপকাটলেট চায়ের দোকান থেকে কে আমার নাম ধরেডাকলে—ও রামরতনবাবু—এই যে—এদিকে—ফিরে চেয়েদেখি পূর্ণবাবু একটা কোণে টেবিলে বসে। পূর্ণবাবুর মাথায়একটা পশমের কানঢাকা টুপি, শালের কম্ফর্টার গলায় জড়ানো, হাতে দস্তানা। আমায় বললেন—আসুন, বসুন—কিছু খাওয়া যাক। আজ ফিরে এলাম মহালথেকে—এই রাতের গাড়িতে ফিরব কলকাতায়— কিছুখাবেন না ?...না, না, খেতেই হবে কিন্তু, সেদিন তো কিছুখেলেন না—এই বয়, ইধার আও—

আমাকে জোর করে পূর্ণবাবু চেয়ারে বসালেন।তারপর তাঁর নিজের জন্যে যা খাবার দিলে, তা দেখেআমার তো হৃৎকম্প উপস্থিত হল। এত খাবেন কি করেপূর্ণবাবু এই বয়সে ?আর একটা অতি বাজে দোকানেখানআষ্টেক চপ, খানচারেক কাটলেট, এক প্লেট মাংস, পাঁউরুটি, ডিমের মামলেট, পুডিং কেক, চা—তিনি কিছু বাদদিলেন না। আমাকে দেখিয়ে বললেন—এই, বাবুকোওয়াস্তে এক প্লেট মাটন্‌ আউর তিন পিস—

আমি সবিনয়ে বললাম—আমার শরীর তো জানেনপূর্ণবাবু, ওসব কিছু আমি—

—আরে তা হোক্‌, শরীর শরীর করলে কি চলে !খান্‌খান্‌—মাংসটা বেশ করেছে—কলকাতায় মাংস রাঁধতে জানে না মশাই রেস্টোরেন্ট—আমি ঝাল পছন্দ করি, কলকাতায়শুধু মিষ্টি—খেয়ে দেখুন মাংসটা—কাট্‌লেটেও এরাকাঁচালঙ্কা-বাটা দিয়েচে—ভারি চমৎকার খেতে—এই বয়, আউর দুটো কাটলেট—

কথাটা শেষ হবার আগেই তাঁর বেজায় কাশির বেগহল—কাশতে কাশতে দম আটকে যায় আর কি !

একটু সাম্‌লে বললেন—বড্ড ঠান্ডা লেগেছে মহালে—সেই জন্যে বেশ একটু গরম চা—চপ...খেয়েদেখবেন ?ভারি চমৎকার চপ করেছে ! এই বয়,—

আমি কথাটা মুখ ফুটে বল্‌লাম—পূর্ণবাবু, আপনার শরীরে এসব খাওয়া উচিত নয়—আর এ ধরনের দোকান তো খুব ভালো নয় ! চা বরং এক কাপ খান, কিন্তু এত এগুলো খেলে—

পূর্ণবাবু হেসে উড়িয়ে দিলেন—খাব না বলেন কিরামরতনবাবু, খাবার জন্যেই সব। শরীরকে ভয় করলেইভয়, ওসব ভাবলে কি আর—আপনিও যেমন।

রেস্টোরেন্ট থেকে বার হয়ে এসে আমায় নীচু স্বরেবললেন—কিছু মনে করবেন না রামরতনবাবু, একসঙ্গে অনেকদিন কাজ করেছি এক জায়গায়, এখানে কোনোভালো বাঈজীর বাড়ি-টাড়ি জানা আছে ?থাকে তো চলুননা, আজ রাতটা—শুনেছি পশ্চিমে নাকি ভালোভালো-কলকাতায় না হয় আজ না-ই গেলাম—

আমি বুঝিয়েবল্‌লাম, পশ্চিমের যে সব জায়গায়ভালো বাঈজী থাকে, গয়া সে তালিকায় পড়ে না। বিহারেরকোথাও নয়। কাশী, লক্ষ্ণৌ, দিল্লি ওদিকেই সত্যিকার বাঈজীবলতে যা বোঝায় তা আছে।

পূর্ণবাবু বললেন—পাটনাতে নেই ?

—আমার তাই মনে হয়।

—এদিকে আর কোথাও নেই ?না হয় এম্‌নি আরকোথাও—

—কোথাও কিছু নেই। আমি ঠিক জানি।

পূর্ণবাবু ওয়েটিং-রুমে ঢুকে আমায় বসতে বললেন।পূর্ণবাবুকে আরো বেশি বৃদ্ধ দেখাচ্ছিল। আমি তাঁর বাড়িতেকে কেমন আছে জিজ্ঞেস করলাম। থাইসিসের রোগী সেইমেয়েটিকে বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা করাচ্ছেন, বড় ছেলেটি বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েচে আজ বছর দুই—সম্পত্তি পাবার আগেই। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপনদিয়ে তার খোঁজ করেচেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এসব গল্পশুনলাম বসে বসে। পূর্ণবাবু গল্পের মধ্যে আরো দু-বার চাআনিয়ে খেলেন, ব্যাগ খুলে ওষুধ খেলেন তিন-চার রকম, কোনটা কবিরাজী, কোনটা বিলেতি পেটেন্ট ওষুধ। দুপ্যাকেট সিগারেট শেষ করলেন।

দেখলাম, পূর্ণবাবু চিরবঞ্চিত জীবনের সর্বগ্রাসী তৃষ্ণার ভোগলালসা মেটাতে উদ্যত হয়েচেন বিকারের রোগীরমতো। চারিধারে ঘনায়মান মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে স্বল্পতৈল জীবনদীপের আলো যত সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতরজ্যোতিঃবৃত্তের সৃষ্টি করচে, উনি ততই উন্মাদ আগ্রহেযেখানে যা পাবার আছে পেতে চান—যা নেবার আছেনিতে চান, জীবনে ওঁর যখন সুবৃষ্টি এল, জল না পেয়েতখন তা আধ-মরা। সেই এল—কিন্তু এত দেরি করেফেললে !

*　　*　　*　　*

আমায় বললেন—একটু কিছু বাড়াবাড়ি খেলেই, ওষুধখেয়ে রাখি। আর হজম করতে পারি নে এখন। আমাদেরপাড়ায় আছে গদাধর কবরেজ...খুব ভালো চিকিচ্ছে করে, এক হপ্তার ওষুধ নেয় দু-টাকা—তারই কাছে ভাবছিএবার—। পূর্ণবাবুর সেই নিমপাতা-বাটা মেখে ভাতখাওয়ার কথা আমার মনে পড়ল, আরো মনে পড়ল পূর্ণবাবুর প্রথম জীবনের শৌখিনতার কথা। এখন তিনিবুঝেছেন আর বেশি দিন বাঁচবেন না, চিরবঞ্চিত জীবনেরসর্বগ্রাসী তৃষ্ণার ভোগলালসা তাঁর—বিকারের রোগীরমতো অসংযত, অবুঝ।

শান্তিরামকে গল্পটা বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে দিব্যিনাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে।